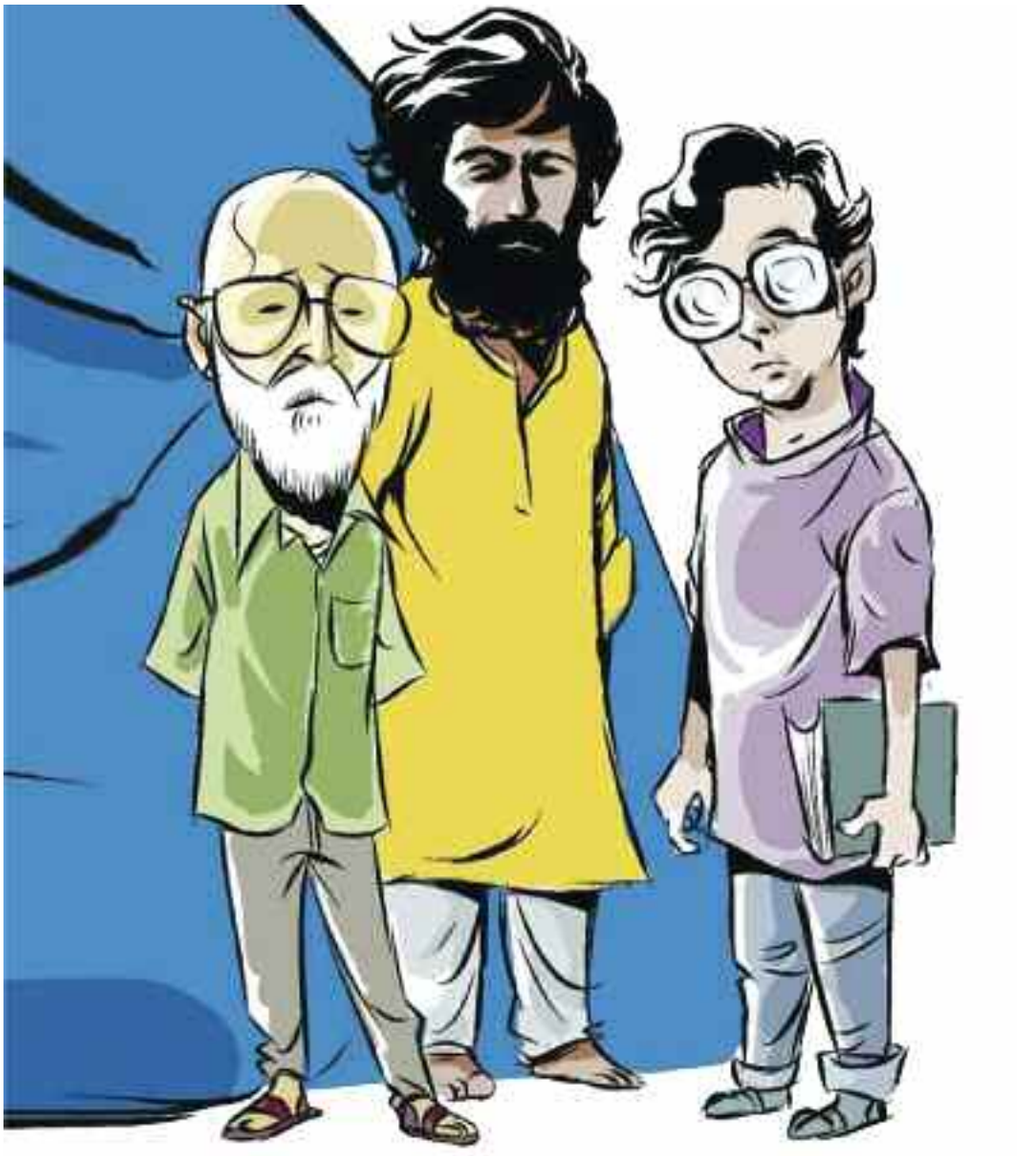

আহমেদ মাওলা

হুমায়ূন আহমেদের হিমু

প্রবন্ধ

চরিত্র সৃষ্টিই যদি কথাসাহিত্যের প্রধান সফলতা বিবেচনা করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রেও হুমায়ূন আহমেদের কৃতিত্ব অতুলনীয়। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সাহিত্যে অবিস্মরণীয়, চৌম্বক আকর্ষক কিছু চরিত্র উপহার দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা এতটাই হৃদয়গ্রাহী, প্রভাবসঞ্চারী যে পাঠক তাঁর উপন্যাস পড়তে পড়তে নিজেই চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন। উপন্যাসের চরিত্র তাঁর ওপর ভূতে পাওয়া মানুষের মতো ভর করে। পাঠক তখন নিজেই বুঝতে পারেন না কখন তিনি সেই উপন্যাসের চরিত্রের অংশ হয়ে গেছেন এবং নিজের অজান্তেই উপন্যাসের চরিত্রের মতো আচরণ শুরু করেছেন। ময়ূরাক্ষী বা হলুদ হিমু কালো র‍্যাব পড়তে পড়তে নিজেই হিমু হয়ে যান, হিমু বনে যান, হিমুর মতো কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। হুমায়ূন আহমেদ সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে হিমালয় বা হিমু তেমনই অসাধারণ, অবিস্মরণীয় জনপ্রিয় একটি চরিত্র। হিমু চরিত্রের তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে যে মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণীদের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ কী? তাঁদের চেতন-অবচেতন মনের স্বপ্ন-চাহিদা কী? সামাজিক অসঙ্গতি

ও বৈষম্যের স্বরূপটা কী? এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন গবেষক-বিশ্লেষকদের মনোযোগ দাবি করে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ওই দিকে কেউ নজর দেননি। প্লটনির্ভর নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা উপন্যাস লিখতে লিখতে একসময় হুমায়ূন আহমেদের মনে হলো, এই আঙ্গিক দিয়ে তিনি সমকালীন সমাজকে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরতে পারছেন না। আঙ্গিক নিরীক্ষার প্রয়োজনেই হুমায়ূন আহমেদ চরিত্রনির্ভর উপন্যাস লেখায় হাত দেন। ১৯৮৫ সালে দেবী ১৯৮৭ সালে নিশিথিনী, অন্যভুবন ইত্যাদি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে শুরু হয় যুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রহস্য উন্মোচনকারী চরিত্র মিসির আলি। মিসির আলির বিপরীত চরিত্র হিসেবেই হিমুর আবির্ভাব। মিসির আলির কাজ করেন লজিক দিয়ে আর হিমু কাজ করে অ্যান্টি-লজিক দিয়ে।

এই দ্বৈতসত্তা সত্যি বিস্ময়কর। অনেকে এই দ্বৈততাকে হুমায়ূন আহমেদের দ্বৈতসত্তার প্রকাশ মনে করেন। কথাটা একেবারে অমূলক নয়। এক সাক্ষাৎকারে হুমায়ূন আহমেদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'হিমুর শুরুটা কীভাবে?'

জবাবে হুমায়ূন আহমেদ বলেছিলেন, ময়ূরাক্ষী নামে আমি একটি উপন্যাস লিখেছিলাম। সেখানে হিমু নামের একটা চরিত্র ছিল। লেখার পর দেখলাম, এই হিমু চরিত্রটিকে আমার নিজের ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল। এই ভালোলাগা থেকেই হিমুর দ্বিতীয় বই লিখে ফেললাম। ব্যস, এভাবেই শুরু।' ... আমি আসলে অর্ধেক হিমু, অর্ধেক মিসির আলি। হা হা' বসন্ত বিলাপ, *প্রথমা প্রকাশন ২০১২, পৃ : ১৩৫)*

মানুষের জীবন একরৈখিক নয়। বিচিত্র, বহুভুজ অনুষঙ্গ নিয়ে জীবনের অভিযাত্রা। সমাজ নামক এক অদৃশ্য দেয়ালে বন্দি, নিয়তি নামক অদেখা শক্তির নিয়ন্ত্রণ, বাস্তবতার চাপে ও তাপে মানুষ তার স্বাভাবিক স্বভাব হারিয়ে কখনো অতিমানব, কখনো মহামানব হয়ে ওঠে। ভিন্ন স্বভাব বা চরিত্র নিয়ে হয়ে ওঠে মহীরুহ, প্রতিভূ, নেতা, নায়ক, দেবতা কিংবা ঘৃণিত খলচরিত্র। চরিত্রের কারণেই মানুষ হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ, স্মরণীয়।

সাহিত্যের ইতিহাসে এ রকম শ্রেষ্ঠ, স্মরণীয় চরিত্র আছে অনেক। যেমন হোমারের হেলেন, টলস্টয়ের আন্না কারেনিনা, সফোক্লিসের রাজা ইডিপাস, শেক্সপিয়ারের ওথেলিয়া, জুলিয়েট, ডেসডিমোনা, ইয়াগো, হেমলেট, ইবসেনের নোরা, কালিদাসের শকুন্তলা, রবীন্দ্রনাথের গোরা, শরৎচন্দ্রের দেবদাস, শ্রীকান্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুবের মাঝি, হোসেন মিয়া, শশী ডাক্তার; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মজিদ, সৈয়দ শামসুল হকের বাবরালি, সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীল লোহিত, হুমায়ূন আহমেদের মিসির আলি এবং হিমু অবিস্মরণীয় চরিত্র। এই চরিত্রগুলো সম্পূর্ণই কল্পনার সৃষ্টি কিন্তু সময়ের প্রতিনিধিত্বশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র। লেখকেরা যেন বাস্তবের মাটি দিয়ে কল্পনার একেকটা প্রতিমূর্তি গড়ে তুলেছেন। হুমায়ূন আহমেদ হিমু চরিত্র নিয়ে লিখেছেন বেশকিছু উপন্যাস। প্রত্যেকটি হিমু চরিত্রই আলাদা এবং ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে চিত্রিত। প্রত্যেকটি হিমু চরিত্রই প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি দাঁড়ায়, জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে। হিমু চরিত্রের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের অসঙ্গতি, অনিয়ম, অন্যায়, শোষণ, নির্যাতন, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংস্থার ভেতরের চারিত্র্য, স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। কখনো কখনো হিমু, বুদ্ধিদীপ্ত উদ্ভট আচরণ ও সংলাপের মধ্য দিয়ে সমাজের অসঙ্গতিকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পরিস্থিতি মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়িয়েছে। দরজার ওপাশে উপন্যাসের একটি সংলাপের জন্য হুমায়ূন আহমেদকে আসামির কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে হয়েছে। প্রবল প্রতিকূল রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তিনি লিখেছেন হলুদ হিমু কালো র‍্যাব (২০০৬)-এর মতো দারুণ চ্যালেঞ্জিং উপন্যাস। নিজের নাম হুমায়ূন, এই নামকে মোহনীয় কিংবা স্মরণীয় করে তোলার কোনো গোপন ইচ্ছা থেকে হিমু চরিত্রের আবির্ভাব কিনা, সেটা আজ গবেষণার বিষয়। না হলে শেষ বয়সে ইতিহাসের পাতা থেকে সম্রাট হুমায়ূনকে নিয়ে তিনি কেন বাদশা নামদার (২০১১)-এর মতো উপন্যাস লিখলেন? এসব প্রশ্ন অমূলক নয়, অনুসন্ধানের বিষয়। হিমু চরিত্র নিয়ে রচিত উপন্যাসগুলো হচ্ছে ময়ূরাক্ষী (১৯৯০), দরজার ওপাশে (১৯৯২), হিমু (১৯৯৩), পারাপার (১৯৯৩), এবং হিমু (১৯৯৫), হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম (১৯৯৬), হিমুর দ্বিতীয় প্রহর (১৯৯৭), হিমুর রূপালী রাত্রি (১৯৯৮) একজন হিমু কয়েকটি ঝিঁঝি পোকা (১৯৯৯), তোমাদের এই নগরে (২০০০), চলে যায় বসন্তের দিন (২০০২), সে আসে ধীরে (২০০৩), হিমু মামা (২০০৪), আঙ্গুল কাটা জগলু (২০০৫), হলুদ হিমু কালো র‍্যাব (২০০৬), আজ হিমুর বিয়ে (২০০৭), হিমু রিমান্ডে (২০০৮), হিমুর একান্ত সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য (২০০৮), হিমুর বারার কথামালা (২০০৯), হিমুর মধ্যদুপুর (২০০৯), হিমুর নীল জোছনা (২০১০), হিমুর আছে জল (২০১১), হিমু এবং একটি রাশিয়ান পরী (২০১১), হিমু এবং হার্ভার্ড পিএইচডিবল্টু ভাই (২০১২) মোট ২৪টি উপন্যাস।

হিমু-সংক্রান্ত উপন্যাসের শিরোনাম দেখেই বোঝা যায় হিমু চরিত্রের ক্রমবিকাশ এবং এর রকমফের। হিমু অনেকটা ইচ্ছাপূরণ-টাইপ একটি চরিত্র। মানুষের অনেক গোপন বাসনা থাকে। অনেক ইচ্ছাই জীবনে পূরণ হয় না। তা নিয়ে মনের ভেতর প্রচণ্ড আক্ষেপ থাকে। ইশ্! আমার যদি এমন অলৌকিক ক্ষমতা থাকত। যদি আমি যা চাই তা-ই হতো। তাহলে কত অসম্ভব না আমি সম্ভব করতে পারতাম। এই অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা, হিমুর মধ্যে মানুষের এই অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণের একটা ব্যাপার আছে। সে মানুষের হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে এবং সে যা বলে প্রায় তা ঘটে। এ কারণে হিমুকে কখনো অলৌকিক বা অধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী বলেও ভ্রম হয়। আসলে ব্যাপারটা অলৌকিক কিছু নয়, মানব মস্তিষ্কের মধ্যে আছে এক অসাধারণ 'ইন্টুয়েশন পাওয়ার' ধারণা বা পূর্বানুমান ক্ষমতা। খুব অল্প বয়স থেকে এই 'ইন্টুয়েশন পাওয়ারের' চর্চা করতে পারলে একসময় সে ভালো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হয়ে উঠতে পারে। হুমায়ূন আহমেদ হিমু চরিত্র নির্মাণে এই 'ইন্টুয়েশন পাওয়ারকে' দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। হিমুর কাণ্ডকারখানায় ইচ্ছাপূরণের প্রতিফলন ঘটে থাকে। আপতদৃষ্টিতে উদ্ভট, যুক্তিহীনভাবে হিমু এমন সব কাজ করে ফেলে, যা পাঠকের মনে আনন্দের পরশ বুলায়। যা কেউ পারে না, অথবা পারছে না, তা ঘটতে দেখলে কার না ভালো লাগে! হিমু চরিত্রের জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে এই অচরিতার্থ ইচ্ছাপূরণের খেলা।

হিমুর বাবার কথামালা (২০০৯) এবং হিমুর একান্ত সাক্ষাৎকার (২০০৮) গ্রন্থ পড়ে হিমু চরিত্র সম্পর্কে কিছু তথ্য, কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। যেমন—হিমুর পুরো নাম হিমালয়, ডাক নাম হিমু। পর্বতের নামে নাম রাখার উদ্দেশ্য, পর্বত স্পর্শ করা যায় কিন্তু আকাশ স্পর্শ করা যায় না। হিমুর বাবা ছেলেকে প্রথাগত ধারায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চাননি। তিনি ছেলেকে 'মহাপুরুষ' বানাতে চেয়েছেন। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, প্রচলিত শিক্ষায় যদি ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানানো সম্ভব হয়, তবে 'মহাপুরুষ' বানানো যাবে না কেন? হিমুর বাবা নিজেই তাই 'মহাপুরুষ' বানানোর স্কুল খুলে বসেন এবং এই স্কুলের একমাত্র শিক্ষক হিমুর পিতা, একমাত্র ছাত্র পুত্র হিমু বা হিমালয়। হিমুবিষয়ক কোনো বইপত্রে হিমুর পিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে বোঝা যায় ভদ্রলোক অদ্ভুত ধরনের মানুষ ছিলেন। পুত্রকে 'মহাপুরুষ' হিসেবে তৈরি করার জন্য নানা রকম ট্রেনিং অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ : ৭৫ সেকেন্ড পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে রেখে মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা দান করা। টিয়ে পাখি উপহার দিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করে পাখিটাকে গলাটিপে হত্যা করে মায়া নামক আসক্তি থেকে মুক্ত করা। মাতৃস্নেহের বাঁধন মুক্ত করার লক্ষ্যে হিমুর মাকেও তিনি হত্যা করেছিলেন। এভাবে পুত্রকে মহাপুরুষ হিসেবে তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেই পিতা খান্ত হননি, মৃত্যুর পূর্বে রেখে গেছেন লিখিত নির্দেশনাবলি। মৃত্যুর পর অদৃশ্য থেকে পিতা নিয়ন্ত্রণ করেছেন হিমুর জীবন।

হিমু চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো অদ্ভুত, অস্বাভাবিক কিন্তু আকর্ষণীয়। সেই আকর্ষণ নিষিদ্ধ বস্তুর স্বাদ গ্রহণের মতো আনন্দের। তাই যখন মন খারাপ হয়ে যায়, হিমুবিষয়ক বই পড়লে পাঠকের মন ভালো হয়ে যায়। জাগতিক সব দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে মন ফুরফুরে আনন্দে ভরে ওঠে। হিমু সমগ্রের (২০০৬) ভূমিকায় হুমায়ূন আহমেদ নিজেই লিখেছেন, 'মন মেজাজ খারাপ থাকলেই হিমু লিখতে বসি। মন ঠিক হয়ে যায়। বেশি লেখার ফল সব সময় শুভ হয় না। আমার ক্ষেত্রেও হয়নি। অনেক জায়গাতেই লেজেগোবরে করে ফেলেছি। হিমুর পাঞ্জাবির পকেট থাকে না, অথচ একটা বইয়ে লিখেছি, সে পকেট থেকে টাকা বের করল। হিমুর মাজেদা খালা এক বইয়ে হয়ে গেল মাজেদা ফুফু।' (হিমু সমগ্র, অনন্যা, ভূমিকা) এসব ছোটখাটো বিচ্যুতি পাঠকমনে হিমু উপন্যাসের রস গ্রহণে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি। হুমায়ূন আহমেদের কলমের জাদুকরি শক্তির

জয় এখানেই।
হিমুর বয়স ১৬ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। তার বয়স এর চেয়ে বাড়ে না। সে থাকে তার নিজস্ব জগতে। বাবার কঠিন নির্দেশনাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় হিমুর জীবন। তার একটা নিজস্ব নদী আছে, নাম 'ময়ূরাক্ষী'। যখন-তখন সে ময়ূরাক্ষী নদীকে কল্পনায় নিয়ে এসে তাতে মন ডুবিয়ে দিয়ে সময় পার করে দিতে পারে। হিমু চলাফেরা করে খালি পায়ে। তার পোশাক হচ্ছে পকেটবিহীন কটকটে হলুদ রঙের। তার কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে। যে তার সঙ্গে একবার মিশে, কথা বলে, সেই তার ভক্ত, অনুগত হয়ে পড়ে। পুলিশ হিমুকে থানায় ধরে নিয়ে গেলেও আবার জামাই আদর করে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যায়। তার কোনো পেশা নেই। টাকা-পয়সার প্রয়োজন হলে বিত্তবান আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবীরা দেয়। এদের মধ্যে মাজেদা খালা, রূপা, ফুফা অন্যতম। ফুফা হিমুকে টাকা দেয় তার বাসার আশপাশ দিয়ে না আসার জন্য। কারণ বাদল হিমুর মহাভক্ত। হিমু যা করে বাদল হুবহু তা অনুসরণ করে। যেমন—
'জরুরি কথা, বাদল সম্পর্কে
জি বলুন।
ও তোমাকে কেমন অনুসরণ করে সেটা লক্ষ্য করেছ? তুমি তোমার মুখে দাঁড়ি-গোঁফের চাষ করছ— করো। সেও তোমার পথ ধরেছে। আজ তুমি হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেছ, আমি এক হাজার টকা বাজি রাখতে পারি, কাল দুপুরে সে হলুদ পাঞ্জাবি কিনবে।
আমি কি ভুল বলালাম?
না, ভুল বলেননি।
তুমি যদি আজ মাথা কামাও, আমি সিউর, ব্যাটা কাল মাথা কামিয়ে ফেলবে। এ রকম প্রভাব তুমি কী করে ফেললে এটা তুমি আমাকে বল।
ণড়ঁ নবঃঃবৎ ঃড় বীঢ়ষধরহ রঃ.
আমার জানা নেই ফুপা।' *(ময়ূরাক্ষী, পৃ : ২৪।)*
বাদলকে হিমুর প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য ফুপা হিমুকে প্রথমে একটা চাকরির অফার দেয়। বলে, ভিক্ষা করে জীবন-যাপন করার চেয়ে চাকরি অনেক ভালো না? হিমু তার উত্তরে বলে, 'না। ভিক্ষা করে বেঁচে থাকার আলাদা আনন্দ আছে। প্রাচীন ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীদের সবাই ভিক্ষা করতেন। বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার একটা বড় অঙ্গ হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি। এরা অবশ্য ভিক্ষা বলে না। এরা বলে মাধুকরী।' এ যুক্তি অকাট্য। তবু ফুপা প্রশ্ন করে, 'যে জীবন-যাপন করছ তাতে আনন্দটা কী?'
'যা ইচ্ছা করতে পারার একটা আনন্দ আছে না?' *(ময়ূরাক্ষী, পৃ : ২৬)*
হিমু চরিত্রের এই বন্ধনহীন, বাউন্ডেলে, বোহেমিয়ান জীবন-যাপনের মধ্যে যে আনন্দ আর মুক্তির স্বাদ আছে, যেটাকে ফ্যান্টাসিও বলা যায়— প্রথাগত ধরাবাঁধা জীবনের তুলনায় হিমু চরিত্রের এই ফ্যান্টাসি জীবনযাপন মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণীদের অধিক প্রিয় হয়ে ওঠে।
এ উপন্যাসে দেখা যায়, বাদল থেকে দূরে রাখার জন্য, ফুপুর বাসায় না আসার জন্য ফুপা হিমুকে প্রতি মাসে টাকা দেয়। মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণেরা যেখানে বাস্তব জীবনে চার দেয়ালে বন্দি, হিমু সেখানে নিয়মের দেয়াল ভেঙে অনিয়মের পথেই চলে, এ বিষয়টি সদ্য তরুণদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে।
হিমু চরিত্রের আরেকটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অলৌকিক ক্ষমতা। ময়ূরাক্ষী উপন্যাসে রূপা অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাপারে হিমুকে জিজ্ঞাসা করে—
'আমি শুনেছি তুমি ভবিষ্যতের কথা বলতে পারো, হাত দেখতে পারো। অলৌকিক কিছু ক্ষমতা তোমার আছে। আমি সেই সম্পর্কে জানতে চাই। আমার সঙ্গে মিথ্যা বলার দরকার নেই। সত্যি করে বলো তোমার কি এ জাতীয় কোনো ক্ষমতা আছে?
আছে।
... যেমন ধরো, আজ তোমাকে নিতে গাড়ি আসবে না। তোমাকে রিকশা নিয়ে ফিরতে হবে।
এটা ঠিক হয়েছে। কাকতালীয়ভাবে বলে ফেলেছ।
এ ছাড়া আমি বলতে পারি তোমার হ্যান্ডব্যাগে কত টাকা আছে?
কত আছে?
'একশ' টাকার নোট আছে দুটা। একটা কুড়ি টাকার নোট। এক টাকার নোট আছে সাতটা। কিছু খুচরা পয়সা, কত বলতে পারছি না।
রূপা হাসি মুখে তাকিয়ে রইল।
আমি বললাম, বাক্স খুলি তুমি গুনে দেখো, ঠিক বললাম কি না।
আমি গুনতে চাই না।
গুনতে চাও না কে?
গুনলে দেখা যাবে তুমি ঠিক বলোনি। তখন আমার মনটা খারাপ হয়ে যাবে। তোমার কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে, এটা বিশ্বাস করতে আমার ভালো লাগছে। চারদিকে এত সব সাধারণ মানুষ, এর মধ্যে একজন কেউ থাকুক, যে সাধারণ নয়, অসাধারণ।
(ময়ূরাক্ষী, পৃ : ৬৬)
রূপা সত্যি হিমুর অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে যায়। হিমুকে সে ভালোবেসে ফেলে। হিমু কিন্তু প্রেমের মায়ার বন্ধনে বন্দি হওয়ার মতো চরিত্র না। তাই উপন্যাসের শেষে হিমুকে বলতে শোনা যায়, 'আমি কি রূপাকে বলতে পারি আমার বাবার স্বপ্ন সফল করার জন্য সারাদিন আমি পথে পথে ঘুরি। মহাপুরুষ হওয়ার সাধনা করি। যখন খুব ক্লান্ত অনুভব করি, তখন একটি নদীর স্বপ্ন দেখি। যে নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে একজন তরুণী ছুটে চলে যায়। একবার শুধু থমকে দাঁড়িয়ে তাকায় আমার দিকে। তার চোখে গভীর মায়া ও গাঢ় বিষাদ। এই তরুণীটি আমার মা। আমার বাবা যাকে হত্যা করেছিলেন। ...আমি সারাদিন হাঁটি। আমার পথ শেষ হয় না।'
(ময়ূরাক্ষী, পৃ. ৬৮)
হিমু চরিত্রের স্বরূপ এভাবে উন্মোচিত হয় পাঠকের সামন। এ ছাড়া হিমুর বাবার নির্লিপ্ততা উপদেশমালার মধ্যেও কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—
'পৃথিবীর সকল মহাপুরুষ এবং মহাজ্ঞানী এই জগতকে মায়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্বামী ও স্ত্রীর প্রেমে যেমন মায়া বই কিছুই নয়, ভ্রাতা ও ভগ্নির স্নেহ সম্পর্কও তাই। যে কারণে স্বার্থে আঘাত লাগিবা মাত্র স্বামী-স্ত্রীর প্রেম বা ভ্রাতা-ভগ্নির ভালোবাসা কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়। কাজেই তোমাকে পৃথিবীর সর্ব বিষয়ে পুরোপুরি নির্লিপ্ত হইতে হইবে। কোনো কিছুর প্রতিই তুমি যেমন আগ্রহ বোধ করিবে না, আবার অনাগ্রহও বোধ করিবে না। মানুষ মায়ার দাস। সেই দাসত্বশৃঙ্খল তোমাকে ভাঙিতে হইবে। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। চেষ্টা করিলে তুমি তা পারিবে। (ময়ূরাক্ষী)।
ঘুমাইয়া রাত নষ্ট করিও না। দিনে নিদ্রা যাইবে, রাত কাটাইবে অনিদ্রায়। কারণ রাত্রি আত্ম-অনুসন্ধানের জন্য উত্তম। জগতের সকল পশু নিশিযাপন করে। পশুমাত্রই নিশাচর। মানুষ এক অর্থে পশু। নিশিযাপন তার অবশ্য কর্তব্যের একটি।
যে মানবসন্তান ক্ষুদ্র কামনা জয় করতে পারে, সে বৃহৎ কামনাও জয় করতে পারে— এই মহৎ বাণী আমার বাবার।'
(দরজার ওপাশে)
হে মানবসন্তান, তুমি তোমার ভালোবাসা লুকাইয়া রাখিও। তোমার পছন্দের মানুষদের প্রতি তুমি রূঢ় আচরণ করিও যেন সে তোমার স্বরূপ কখনো বুঝিতে না পারে। মধুর আচরণ করিবে দুর্জনের সঙ্গে। নিজেকে অপ্রকাশ্য রাখার ইহাই প্রথম পাঠ। (হিমু)
'বাবা হিমালয়,
ভালো কর্ম বা সৎকর্ম তোমার প্রয়োজন নাই। সৎকর্ম নেশার মতো। একটি সৎকর্ম করলে আরেকটি করতে ইচ্ছা করবে। সৎকর্মের নেশা তৈরি হবে। যেকোনো নেশাই মানুষের জন্য ক্ষতিকর। নেশা হলো নেশা। ভালো নেশা মন্দ নেশা বলে কিছু নেই।'
(হিমুর নীল জোছনা)
'তোর ঘুমুলে চলবে না। মহাপুরুষদের সব কিছু জয় করতে হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম। ঘুম হচ্ছে দ্বিতীয় মৃত্যু। সাধারণ মানুষ ঘুমায়—
অসাধারণরা জেগে থাকে।
(পারাবার)
'হিমালয়,
তুমি অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছ। আমার অভিনন্দন। অষ্টাদশ বর্ষকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। এই বয়সে নারী ও পুরুষ যৌবনপ্রাপ্ত হয়।
প্রিয় পুত্র, তোমাকে আজ আমি তরুণ-তরুণীর আকর্ষণের বিষয়ে আমার দীর্ঘদিনের চিন্তার ফসল বলিতে চাই। মন দিয়া পাঠ করো। তরুণ-তরুণীর আকর্ষণের সমগ্র বিষয়টাই পুরোপুরি জৈবিক।

ইহা পশুধর্ম।
প্রিয় পুত্র, প্রেম বলিয়া জগতে কিছু নেই। ইহা শরীরের প্রতি শরীরের আকর্ষণ। এই আকর্ষণ প্রকৃতি তৈরি করিয়াছে, যাহাতে তাহার সৃষ্টি বজায় থাকে। প্রিয় পুত্র, মানুষ ভান করিতে জানে, পশু জানে না। এই বিষয় ছাড়া মানুষের সঙ্গে পশুর কোনো তফাত নেই। যদি কখনো কোনো তরুণীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করো, তখন অবশ্যই তুমি সেই আকর্ষণের স্বরূপ অনুসন্ধান করিবে। দেখিবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু তুচ্ছ শরীর। শরীর যেহেতু নশ্বর, সেহেতু প্রেমও নশ্বর।
প্রিয় পুত্র, মানুষ মায়াবদ্ধ জীব। মায়ায় আবদ্ধ হওয়াই তাহার নিয়তি। তোমাকে মায়ামুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে বড় করিয়াছি।'
'বাবা বললেন, কেমন আছিস?
আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, খুব ভালো আছি।
বাবা নিচু গলায় বললেন, তুই তো সব গণ্ডগোল করে ফেলেছিস।
এত শখ ছিল তুই মহাপুরুষ হবি। এত ট্রেনিং দিলাম...
ট্রেনিং দিয়ে কি আর মহাপুরুষ বানানো যায়, বাবা?
ট্রেনিং দিয়ে যদি ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানানো যায়, তাহলে মহাপুরুষ বানানো যাবে না কেন? অবশ্যই যায়।
তাহলে তোমার ট্রেনিংয়ে গণ্ডগোল ছিল।
উহু, ট্রেনিংয়ে কোনো গণ্ডগোল নেই। তুই নিয়মকানুন মানছিস না। মহাপুরুষের প্রথম শর্ত হলো কোনো ব্যক্তিবিশেষের ওপর মায়া করবি না। মায়া হবে সর্বজনীন। মায়াকে ছড়িয়ে দিবি।
তাই তো করছি।
মোটেই তা করছিস না। তুই জড়িয়ে পড়ছিস। মারিয়াটা কে?
মারিয়া হচ্ছে মরিয়ম।
তুই এই মেয়ের সঙ্গে এমন জড়ালি কেন?'
(হিমুর হাতে কয়েকটি নীল পদ্ম)
'আমার বাবা বলে গেছেন, দুটি বাক্যে কখনোই বলা যাবে না। একটা হলো ও ষড়াবুড়ঁ, আরেকটা হলো ও hate you. তার মতে দুটি বাক্যের অর্থ একই।
(হিমুর আছে জল)
'অদ্য রজনীতে হিমালয়কে ভয় জয় করিবার প্রস্তুতিসূচক ট্রেনিং দেওয়া হইবে। মানুষের প্রধান ভয় অন্ধকারকে, যে অন্ধকারের স্মৃতি সে অন্য কোনো ভুবন থেকে লইয়া আসিয়াছে। অন্ধকারকে জয় করার অর্থ সমস্ত ভয়কে জয় করা।'
(এবং হিমু)
'হে প্রিয় পুত্র, মিথ্যার কিছু কিছু উপকার আছে। কিছু মিথ্যা সমাজের এবং ব্যক্তিজীনের ক্ষেত্রে কল্যাণকর ভূমিকা নেয়। কিন্তু মিথ্যা মিথ্যাই। সত্য আলো, মিথ্যা অন্ধকার।'
(তোমাদের এই নগরে)
'তুমি নিজেকে যা মনে করো তুমি তা-ই। তুমি যদি নিজেকে মহাপুরুষ ভাবো, তুমি মহাপুরুষ। আর তুমি যদি নিজেকে পিশাচ ভাবো, তুমি পিশাচ।'
(আজ হিমুর বিয়ে)
'সুউচ্চ এভারেস্ট জয় সম্ভব, ভয় জয় করা সম্ভব না। একজন মহাপুরুষ এই অসম্ভবকে সম্ভব করবেন। যখন তিনি এই কাজটি পারবেন সেদিন...'
(হিমু রিমান্ডে)
'সব মহাপুরুষের কিছু দিন কুকুর জীবন-যাপন করা বাধ্যতামূলক।'
(হিমুর মধ্য দুপুর)
আসক্তি বিষয়ে হিমুর বাবার উপদেশ
'তোমার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তুমি কিছু মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষের সাক্ষাৎ পাইবে। অতি অবশ্যই তুমি তাহাদের নিকট হইতে সহস্র হাত দূরে থাকিবে। কারণ মহাপুরুষদের আকর্ষণীয় ক্ষমতা প্রবল। একবার তাহাদের আকর্ষণীয় ক্ষমতার ভেতর পড়িলে আর বাহির হইতে পারিবে না। তাহাদের বলয়ের ভেতরে থাকিয়া তোমাকে চক্রাকারে ঘুরিতে হইবে। ইহা আমার কাম্য নয়।'
(হিমুর মধ্য দুপুর)
হিমুর বাবার এসব নির্দেশনাবলি, ট্রেনিং শেষ পর্যন্ত কি হিমুকে মহাপুরুষে পরিণত করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে পাঠককে হিমুবিষয়ক উপন্যাসমালার দিকে ফিরে তাকাতে হয়। আমরা দেখি, হিমু পরিপূর্ণ

হিমু চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো অদ্ভুত, অস্বাভাবিক কিন্তু আকর্ষণীয়। সেই আকর্ষণ নিষিদ্ধ বস্তুর স্বাদ গ্রহণের মতো আনন্দের। তাই যখন মন খারাপ হয়ে যায়, হিমুবিষয়ক বই পড়লে পাঠকের মন ভালো হয়ে যায়। জাগতিক সব দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে মন ফুরফুরে আনন্দে ভরে ওঠে। হিমু সমগ্রের (২০০৬) ভূমিকায় হুমায়ূন আহমেদ নিজেই লিখেছেন, 'মন মেজাজ খারাপ থাকলেই হিমু লিখতে বসি'

মহাপুরুষে পরিণত হয়নি। তার বাবার ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত অপূর্ণই থেকে যায়। তবে হিমু মহাপুরুষের বেশকিছু গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। যেমন মায়া-মোহ থেকে মুক্তি। আসক্তি থেকে মুক্তি। অন্যের ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করার শক্তি। অলৌকিক কিছু ক্ষমতাও হিমু অর্জন করে। সে যা বলে প্রায় তা ঘটে। পুলিশ তার গালে চড় মারলে সে পুলিশের হাত ফুলে ব্যথা হয়ে যায়। পরে সে পুলিশ তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায় ইত্যাদি। তবে হিমু যেটা করতে পারেনি তা হচ্ছে, ভয়কে সে জয় করতে পারেনি। সম্ভবত ভয়কে জয় করতে পারলেই সে মহাপুরুষে উন্নীত হতে পারত। হিমুর একান্ত সাক্ষাৎকারে হুমায়ূন আহমেদ নাটকীয়ভাবে হিমুর মাজেদা খালা, হিমুর কাল্পনিক বিয়ের কন্যা মিস কণা, কোতোয়ালি থানার ওসি কামরুল, হিমুর লেখকের ছোট ভাই আহসান হাবীব, বইমেলায় হলুদ পাঞ্জাবি পরে হিমু সেজে যাওয়া সেই মোটা তরুণ এবং স্বয়ং হিমুর স্রষ্টার সাক্ষাৎকার নেওয়া হলেও তাঁদের কাছ থেকে হিমু সম্পর্কে তেমন কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রতিবেদক এই বলে সাক্ষাৎকার শেষ করেছেন যে আগামী দিনে কোনো এক সংখ্যায় হিমুর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হবে, তখন হিমু সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। এ থেকে বোঝা যায়, কাল্পনিক চরিত্র হলেও হুমায়ূন আহমেদ হিমু চরিত্রকে পাঠকের সামনে স্পষ্ট করে তুলতে চান না, একটা রহস্যের আবরণে ঢেকে রাখতে চান। হয়তো শিল্পের প্রয়োজনেই লেখক এ কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং সেটা যুক্তিসঙ্গত বলা যায়। তবে হিমুর একান্ত সাক্ষাৎকারে দুই প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা পেয়ে যাই তা হচ্ছে, হিমুকে লেখক মেরে ফেলতে চেয়েছেন কিন্তু কীভাবে মারবেন সেটা ঠিক করতে পারেননি বলে এখনো মারেনি। ভাগ্যিস! লেখকের হাতে হিমুর জীবনাবসান ঘটেনি। হিমু আছে, হিমু থাকবে। হিমুর বয়স বাড়বে না, হিমু বদলাবে না। হিমু থাকবে তার নিজস্ব জগত নিয়ে, সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে হিমু। পকেটহীন হলুদ পাঞ্জাবি পরা, খালি পায়ে হাঁটছে হিমু। তার বাবার স্বপ্ন সফল করার জন্য পথে পথে ঘুরছে হিমু। মহাপুরুষ হওয়ার সাধনা করছে সে। গন্তব্যহীন গন্তব্যে তার যাত্রা। সকালে-বিকেলে জোছনা রাতে, ঢাকার ফুটপাতে প্যারিসে, জার্মানিতে, রাশিয়ায়, আমেরিকায়, লন্ডনের কোনো গলিতে দেখা হয়ে যাবে হঠাৎ হিমুর সঙ্গে।
হিমু চরিত্রকে দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ সে সমকালীন সমাজের অসঙ্গতি এবং রাষ্ট্রীয় ত্রুটির তীক্ষ্ণ বাস্তবতা তুলে ধরেছেন তা শুধু নয়, শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে অনেক ঝুঁকিও নিয়েছেন তিনি। দুটি উদাহরণ

এখানে তুলে ধরছি। ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয় দরজার ওপাশে উপন্যাস। এ উপন্যাসে হিমুর মামার একটা সংলাপের জন্য জজ সাহেবেরা লেখকের নামে আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে মামলা করেন। হুমায়ূন আহমেদ 'নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার' বদলে মামলা মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর পক্ষে দাঁড়ালেন ড. কামাল হোসেন, ভাষাসৈনিক আইনজীবী গাজীউল হক। প্রথম দিন শুনানির পর অজ্ঞাত কারণে এ মামলা ধামাচাপা পড়ে যায়। প্রকারন্তরে জয়ী হয় হিমু। যে বিষয়টা নিয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগ ওঠে, উপন্যাস থেকে তা উদ্ধৃত করছি। একটি উপন্যাসে হিমু তার মামাদের বংশ সম্পর্কে বলেছে, 'তারা পিশাচ শ্রেণির।' পিশাচ হলেও তারা হিমুকে খুব স্নেহ করেন। দরজার ওপাশে উপন্যাসের কাহিনির একপর্যায়ে দেখা যায়, হিমু এক খুনের মামলার আসামিকে বাঁচানোর জন্য মামাকে চিঠি লেখে। চিঠি পেয়ে মামা ছুটে আসে। হিমু এবং মামার মধ্যে সংলাপ—

'তারপর বল কী ব্যাপার?

একজন লোক জেলখানায় আছে মামা। ওর সঙ্গে দেখা করা দরকার, দেখা করার কায়দা পাচ্ছি না। দরখাস্ত করেছি, লাভ হয়নি।

খুনের আসামি? তিনশ বারো ধারায়?

কোন ধারায় তা জানি না, তবে খুনের আসামি।

এটা কোনো ব্যাপার না। টাকা খাওয়াতে হবে। এই দেশে এমন কোনো জিনিস নাই যা টাকায় হয় না।

টাকা তো মামা আমার নাই।

টাকার চিন্তা তোকে করতে বলছি নাকি? আমরা আছি কী জন্যে? মরে তো যাই নাই। টাকা সাথে নিয়া আসছি। দরকার হলে জমি বেচে দিব। খুনের মামলাটা কী রকম শুনি। আসামি ছাড়ায়ে আনতে হবে?

তুমি পারবে না মামা। তোমার ক্ষমতার বাইরে।

আগে বল, তারপর বুঝব পারব কি পারব না। টাকা থাকলে এই দেশে খুন কোনো ব্যাপারই না। এক লাখ টাকা থাকলে দুটো খুন করা যায়। প্রতি খুনে খরচ হয় ৫০ হাজার টাকা। পলিটিক্যাল থেকে হলে বেশি লাগে।

আমি মোবারক হোসেন সাহেবের ব্যাপারটা বললাম। মামা গালে হাত দিয়ে গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনলেন। সব শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, পুলিশের সাজানো মামলা— পেছনে আছে বড় খুঁটি। কিছু করা যাবে না। ট্রাইব্যুনাল করলে। কোনো আশা নাই। সিভিল কোর্ট হলে আশা আছে। জজ সাহেবদের টাকা খাওয়াতে হবে। আগে জজ সাহেবেরা টাকা খেত না। এখন খায়। অনেক জজ দেখেছি কাতলা মাছের মতো হা করে থাকে। কেইস সিভিল কোর্টে উঠলে আমারে খবর দিয়ে নিয়ে আসবি।

তুমি কি করবে?

সাক্ষী যে কয়টা আছে সবার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে হবে। বলতে হবে, সাক্ষী হয়েছ কী জান শেষ। তারা বিশ্বাস করবে না। তখন একটাকে মেরে ফেলতে হবে। একটা শেষ হয়ে গেলে বাকিগুলো ভয় পেয়ে যাবে।'

(দরজার ওপাশে, পৃ : ৮২)

এ উপন্যাসে মামা চরিত্রটি ছিল খুবই গৌণ। তা ছাড়া, সহজ-সরল, কিছুটা খ্যাপাটে, বোকা ধরনের এ মানুষটির মন্তব্য কোনো উদ্দেশ্যমূলক ছিল না। স্বভাবজাত একটি উক্তি। আমাদের বুঝতে হবে, প্রকৃত লেখক কখনো সমাজের আসল চেহারা আড়াল করেন না। মিথ্যা, অবক্ষয়িত দিকগুলো তুলে ধরতে না পারলে লেখকের হৃদয় দংশিত হয়। তা ছাড়া অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বিচারকের বরখাস্ত, পুলিশের চাকরিচ্যুতির খবর পত্রিকায় হরহামেশা প্রকাশিত হচ্ছে। উপন্যাসে তা তুলে ধরা যাবে না, এ রকম কোনো আইন নেই। তাহলে লেখকের স্বাধীনতা থাকে কোথায়? 'আন্ধা কানুন' চলচ্চিত্রে অমিতাভ বচ্চন আদালতের সামনে যখন খুন করে, তখন কোটি মানুষ হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়। বিচার বিভাগের অন্ধকার দিকগুলো নিয়ে বিশ্বের নানা দেশে অসংখ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। উদ্ধৃতির মধ্যে, 'আগে জজ সাহেবেরা টাকা খেত না। এখন খায়। অনেক জজ দেখিছে কাতলা মাছের মতো হা করে থাকে।' এ বাস্তবতা হিমু চরিত্রের মতো বহুদর্শী মহাপুরুষদের চোখে অপরিজ্ঞাত নয়। হিমু চরিত্রের মাধ্যমেই সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রকে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

সমাজের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার না থাকলে, দুর্লভ সাহস না থাকলে কখনো হলুদ হিমু কালো র‍্যাব (২০০৬)-এর মতো উপন্যাস লেখা সম্ভব হতো না। সমাজ যখন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, রাষ্ট্র যখন বৈরী আচরণ করে, তখন লেখকের বিবেকী উত্থান একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জাগ্রত বিবেকের দহন থেকেই লেখক কলম হাতে নেন। শিল্পের শক্তি, সামাজিক দায় থেকেই হুমায়ূন আহমেদ রচনা করেছেন হিমু সিরিজের উপন্যাস হলুদ হিমু কালো র‍্যাব। রাষ্ট্রের একটা বিশেষ বাহিনী নিয়ে জনমনে উত্থিত অথচ অনুচ্চারিত হাজারো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় হলুদ হিমু কালো র‍্যাব উপন্যাসে। খুব হালকা মেজাজে অনেক সিরিয়াস বিষয়কে অসামান্য শিল্প কৌশলে একটা ট্রিটম্যান দিয়েছেন এখানে তিনি। র‍্যাব এক সময় হিমুকে ধরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যেমন—

'চুপ করে আছেন কেন? আপনার নিজের বিষয় কিছু বলার থাকলে বলুন।

নিজের বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই স্যার। তবে আপনরা চাইলে একটা ছড়া বলতে পারি।

ছড়ার নাম "র‍্যাব"।

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়ালো
র‍্যাব এল দেশে
সন্ত্রাসীরা ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

ছড়ার মানে কী?

এটা হলো স্যার ননসেন্স রাইম। ননসেন্স রাইমের মানে হয় না।

ফাজলামো ধরনের কথা বলে র‍্যাবের হাত থেকে পার পাওয়া যায় না, এটা জানো?

জানি স্যার। উপরে আছেন রব আর নিচে আছেন র‍্যাব।'

(হলুদ হিমু কালো র‍্যাব, পৃ : ১৮)

২০০৪ সালে র‍্যাব গঠিত হয়। 'ক্রসফায়ার' শব্দটি আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে নতুন করে স্থান করে নেয়। গভীর রাতে র‍্যাব ভয়ংকর সন্ত্রাসীকে সঙ্গে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে যায়। তখন পূর্ব থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সহযোগীরা র‍্যাবের ওপর গুলি চালায়। র‍্যাবও পাল্টা গুলি করে। এভাবে চমৎকার একটি সাজানো গল্প দেশের মানুষ প্রতিদিন শুনতে থাকে। ভয়ে সন্ত্রসীরা কেউ দেশান্তরী কেউবা আন্ডারওয়ার্ল্ডে আশ্রয় নেয়। ভয়ংকর সন্ত্রাসীর সঙ্গে কিছু নিরাপরাধীও বিচারহীনভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। এমনই এক প্রেক্ষাপটে হুমায়ূন আহমেদ হিমুকে দাঁড় করিয়ে দেন র‍্যাবের মুখোমুখি। উদ্ধৃত ছড়ার মধ্য দিয়ে তীব্র বিদ্রূপ বাণে অভিঘাত করেছেন তিনি। আঘাতটা সঠিক জায়গায় লেগেও ছিল। র‍্যাব সদর দপ্তরে হলুদ হিমু কালো র‍্যাব বইটি নিয়ে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর মিটিংয়ে বসেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন করেন। পরে অবশ্য কমিটি বাতিল করা হয়। কেউ কেউ বইটি নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত দেন। রাষ্ট্রের এসব তৎপরতার ফলে অন্য কিছু না হলেও বইটির কাটতি বেড়ে যায়। 'ক্রসফায়ারের' মতো সিরিয়াস বিষয়কে নিয়েও হুমায়ূন আহমেদ চমৎকার স্যাটায়ার করেছেন—

'শুভ্রর বাবা বললেন, আপনি কেন আমাদের কর্মকাণ্ড সমর্থন করেন না বলুন তো? আপনার যুক্তিটা শুনি। আপনি চান না ভয়ংকর অপরাধীরা শেষ হয়ে যাক? ক্যান্সার সেলকে ধ্বংস করতেই হয়। ধ্বংস না করলে এই সেল শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আমি বললাম, স্যার, মানুষ ক্যান্সার সেল না। প্রকৃতি মানুষকে অনেক যত্ন করে তৈরি করে। একটা ভ্রূণ মায়ের পেটে বড় হয়। তার জন্য প্রকৃতি কী বিপুল আয়োজনই না করে! তাকে রক্ত পাঠায়, অক্সিজেন পাঠায়। অতি যত্নে তার শরীরের একেকটা জিনিস তৈরি হয়। দুই মাস বয়সে হাড়, তিন মাস বয়সে চামড়া পাঁচ মাস বয়সে ফুসফুস। এত যত্নে তৈরি একটা জিনিস বিনা বিচারে ক্রসফায়ারে মরে যাবে— এটা কি ঠিক?

পিশাচের আবার বিচার কী?

পিশাচেরও বিচার আছে। পিশাচের কথাও আমরা শুনব।

সে কেন পিশাচ হয়েছে এটাও দেখব।'

এমন অকাট্য যুক্তি আর হয় না। মানবাধিকার ও অন্যান্য আইনের জটিল কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। হুমায়ূন আহমেদের লেখার মধ্যে যে অসাধারণত্ব রয়েছে, তা হচ্ছে শিল্পের শক্তি। জাঁ-পল সার্তের সেই অস্তিত্ববাদী দর্শনই হিমুর খেয়ালিপনার প্রধান ভিত্তি। এই অস্তিত্ববাদী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই হিমু প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে এবং সত্যি সে জয়লাভ করে। পাঠক হৃদয়ে হিমু চরিত্রের স্থান তাই অমর, অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।